রক্ত পিপাসু ড্রাকুলা

১। ১লা মে আমি জোনাথন হারকার মিউনিখ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাকে যেতে হবে ট্রানসিলভানিয়া। ৩রা মে, ড্রাকুলা যেমন বলে ছিলেন সেইমত হাজির হলাম হোটেল "গোল্ডেন ক্রোনে"। এই হোটেলের মালিকের কাছেও একটা চিঠি পাঠিয়েছিল ড্রাকুলা। হোটেলের দিকে এগোতেই এক বৃদ্ধা মহিলা আমার হাতে ড্রাকুলার একটা চিঠি দিল। চিঠিটা পড়া শুরু করলাম। তাতে লেখা ছিল,
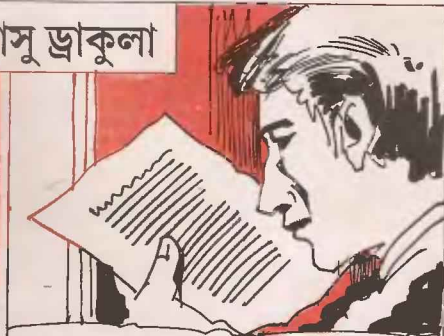
২। রাতটুকু হোটেলে কাটিয়ে কাল ঠিক তিনটের সময় তৈরি হয়ে থাকবেন। ঘোড়ায় টানা একটা গাড়িতে আপনি বুকোভিনার পর্যন্ত যাবেন। সেখানে বোগো গিরিপথে আমার নিজস্ব একটা টমটম গাড়ি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। ঐ গাড়িতে করে আপনি সরাসরি আমার প্রাসাদ দুর্গে পৌছে যাবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ—ড্রাকুলা।

৩। পরদিন হোটেল ছেড়ে যাওয়ার সময়ে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা খুব ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন—প্লীজ, আজ যাবেন না। আমি বললাম, কেন বলুন তো?—আজ মাঝরাতে খারাপ আত্মারা পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে শুনে ভদ্রমহিলা নিজের গলা থেকে ক্রুশ সমেত একটা হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—এটি বিপদে আপনাকে রক্ষা করবে।

৪। ঘোড়ার গাড়ি ছুট্‌তে আরম্ভ করল। ভাবছিলাম ঐ বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কথা—শুধু উনিই নন, উপস্থিত সকলেই কেমন যেন ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেও কিছু জানতে পারলাম না। শুধু বললো, আপনার ওপর অশুভ প্রেতাত্মাদের দৃষ্টি পড়েছে। এদিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য গাড়ির চালক ক্রমাগত ঘোড়াদের পিঠে চাবুক চালাচ্ছিল।
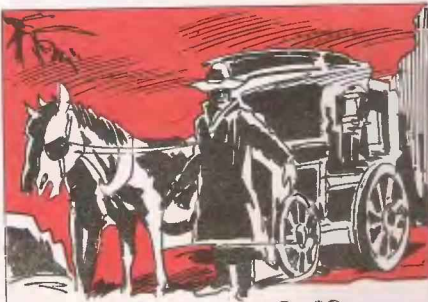
৫। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। কোচোয়ান, চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখল। কোথায় সেই টম্‌টম্‌ গাড়ি? কোথাও তো কোনো গাড়ি দেখছি না। কোচোয়ান আমাকে বুকোভিনায় ফিরে যেতে বললো। এক সহযাত্রী বললে—সেটাই ভালো হবে। কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই অন্ধকারের মধ্য থেকে শোনা গেল ঘোড়ার ডাক। আর এই গাড়ির ঘোড়াগুলোও খুব অস্থির হয়ে উঠলো।

৬। মুহূর্তে চারটে ঘোড়া বিরাট এক সুন্দর ঝকমকে গাড়িকে ঝড়ের বেগে টেনে এনে আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই গাড়ি থেকে বেশ লম্বা একজন কোচোয়ান নেমে এল, তার মুখের অর্ধেকটা ঢাকা, মাথায় বিরাট এক টুপি। সে কর্কশ স্বরে বললো—ভদ্রলোকের সুটকেস কোথায়? আমাদের গাড়ির কোচোয়ান ব্যস্ত হয়ে স্যুটকেশ নতুন গাড়ির কোচোয়ানের হাতে তুলে দিল। আমি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি চলতে শুরু করলো।

৭। গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। সহসা আকাশ বাতাস খান্ খান্ করে অন্ধকার ভেদ করে ভেসে এল অনেকগুলো নেকড়ের ডাক। সেই ভয়ঙ্কর ডাক শুনে ঘোড়াগুলিও ক্রমে কেমন যেন অস্থির হয়ে কোচোয়ানের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করতে লাগল। কোচোয়ান গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াগুলোর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললো। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা আশ্চর্য ভাবে শান্ত হয়ে গেল।

৮। গিরিপথের উপর দিয়ে গাড়ি আবার দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁদিকে অস্পষ্ট এক নীলচে আলো আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। অবাক চোখে সেই নীলচে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখলাম কোচোয়ান গাড়ি থামিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। জনমানবশূন্য ভয়ঙ্কর এক অন্ধকারের মধ্যে আমি গাড়িতে একা বসে আছি। জানালার বাইরে আর নীলচে আলো দেখতে পাচ্ছি না।

৯। হাত দিয়ে চোখ কচলালাম, না, ঠিকই দেখছি। নেকড়েগুলো অলস ভাবে ক্রমশঃ আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করলাম—কিন্তু বাইরে থেকে বন্ধ করা। ভয়ে আমি দরজা ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলাম। চীৎকার করে কোচোয়ান-কে ডাকতে লাগলাম। একটু পরেই কোচোয়ান উপস্থিত হয়ে নেকড়েগুলোর সামনে হাত নেড়ে কিসব বলতেই নিমেষের মধ্যে ওরা পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

১০। আবার ছুটলো গাড়ি। গাড়িতে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে অবশেষে প্রায় ভেঙ্গে পড়া একটা দুর্গের মত বড় বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটায় এসে গাড়ি থামলো। অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোচোয়ান গাড়ি থেকে নেমে, আমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করলো। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিরাট দরজায় কোনো ঘণ্টা বা কড়া দেখতে পেলাম না।

১১। ক্রমে নিজের প্রতি নিজেই ক্ষোভ প্রকাশ করছি। কি দরকার ছিল এই অভিযানের। আমি একজন সাধারণ আইনজীবীর কেরানী মাত্র। কোনো এক মহামান্য ড্রাকুলা লণ্ডনে সম্পত্তি কিনবেন, তার সমস্ত খবরা-খবর জানাবার জন্যেই যেখানে পৌঁছানো খুবই কষ্টকর, তেমন একটা জায়গায় আমাকে আসতে হয়েছে। ...এই নির্জন অন্ধকার ভূতুড়ে জায়গায় কতক্ষণ অপেক্ষা করবো? হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ করে দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল!

১২। আলখাল্লায় ঢাকা বেশ লম্বা এক বৃদ্ধ বাতিদান নিয়ে মধুরস্বরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তিনিই কাউন্ট ড্রাকুলা। তিনি আমাকে ভিতরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। কাউন্ট ড্রাকুলাকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে এলাম। কাউন্ট আমাকে খাবার ঘর ও বিশ্রামের ঘর দেখিয়ে বললেন আপনি নিশ্চয়ই স্নান করবেন। আপনি স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসুন। আমি খাবার ঘরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

১৩। গরম জলে স্নান সেরে পোশাক পাল্টে খাবার ঘরে হাজির হতেই কাউন্ট অল্প হেসে বললেন মিঃ হারকার আপনাকে একাকীই রাতের খাবার খেয়ে নিতে হবে। অপরাধ নেবেন না। আপনি আসার আগেই আমার খাওয়া হয়ে গেছে। রাত অনেক হয়েছে এবার খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন। একথায় আমি একটা মুখবন্ধ খাম কাউন্টের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এটি মিঃ হকিন্স আপনাকে দিয়েছেন।

১৪। খাওয়া শেষ করে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে আমরা গল্পে মশগুল হলাম। দূরে নেকড়ের গান শোনা যাচ্ছিল। ঘুমে আমার দু-চোখের পাতা বুঁজে আসছিল। ওদিকে আকাশ ক্রমশঃ ফিকে হয়েও আসছিল। কাউন্ট আমার অবস্থা বুঝতে পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন আপনি বিশ্রাম নিন, আমি চললাম। বিছানায় শোওয়া মাত্রই রাজ্যের ঘুম আমার চোখে নেমে এল।

১৫। অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখলাম এই মস্ত বাড়ীতে আমি একাই রয়েছি। চাকরবাকররা সব গেল কোথায়! আমি এক এক করে প্রতিটি ঘর দেখলাম, কিন্তু না, কাউকেই দেখলাম না। খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম টেবিলের ওপর খাবার সাজানো রয়েছে। টেবিলের সামনে যেতেই দেখলাম গ্লাসের নিচে একটা ভাঁজ করা কাগজে কাউন্টের লেখা একটা চিঠি। কাউন্টকে একটা বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে।

১৬। সন্ধ্যা নাগাদ কাউন্ট এসে কাজের কথা পাড়লেন। কাউন্টের লণ্ডনে বাড়ি কেনার বিষয়ে সব কাগজপত্তর সুটকেসে গুছিয়ে এনেছিলাম। আমার সব কথা কাউন্ট মন দিয়ে শুনলেন। এরাতও নানারকম কথাবার্তায় কেটে গেল। আকাশ ফিকে হয়ে আসতেই কাউন্ট উঠে পড়ে বললেন, আপনি বিশ্রাম করুন আমি এখন যাই। আরও একটা দিন কেটে গেল। সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি।

১৭। ঘুম থেকে উঠে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গালে হাত দিয়েই বুঝলাম বেশ কয়েকদিন দাড়ি কামানো হয়নি। সুটকেস থেকে আয়নাটা বের করে দাড়ি কামাতে বসতেই হঠাৎ কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল। দেখি কাউন্ট। আচমকা ঘটনাটা ঘটায় ক্ষুরে আমার গাল খানিকটা কেটে গেল। কিছু বলবার আগেই কাউন্ট আয়নাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এসব জিনিস এখানে ব্যবহার করবেন না।

১৮। লক্ষ্য করলাম কাউন্টের দৃষ্টি আমার সদ্য কাটা জায়গাটার দিকে। তারপর মুখে আপসোসের শব্দ করতে করতে আমার মাথাটা ধরে কাটা জায়গাটা তাঁর মুখের সামনে নিয়ে এলেন। কাউন্টের চোখে সে কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, শক্ত হাতে ধরে আছেন আমার মাথাটা; দুটো-হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, গা থেকে বিকট গন্ধ বেরোচ্ছে। একঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। কাউন্ট কোনো কথা না বলে চলে গেলেন।

১৯। ১২ মে। গভীর রাত। এ রাতে কাউন্ট অনেকক্ষণ আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। ঘরময় পায়চারী করছি। কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি গেল। আমি জানালায় ভর দিয়ে ঝুঁকে নিচে কাউন্টের ঘরের দিকে তাকিয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। নিজেকে আড়াল করে সজাগ দৃষ্টি রাখলাম।

২০। দেখলাম, কাউন্টের ঘরের জানালা দিয়ে একটা মাথা বেরিয়ে এলো, তারপর ধীরে ধীরে শরীর, এ আমি কি দেখছি! এ যে কাউন্ট স্বয়ং গুড়ি মেরে জানালার বাইরে বেরিয়ে এলেন। কালো আলখাল্লাটা দু-পাশে ডানার মতো ছড়িয়ে গেল। আতঙ্কে, ভয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। দেখলাম তিনি খাড়াই দেওয়াল বেয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছেন। একি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব?

২১। ১৫ মে। ঠিক করলাম, আজ এই প্রাসাদের প্রতিটি জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখবো। মোমবাতি নিয়ে ঘুরতে গিয়ে হতাশ হ'লাম। বেশিরভাগ ঘরেই তালা লাগানো। উঠে এলাম উপরে, সেখানেও একটা বন্ধ দরজা। খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। একসময় হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কি মনে হওয়ায়, দরজায় মারলাম এক লাথি, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পাল্লা কিছুটা সরে গেল।

২২। আমি আশার আলো পেয়ে প্রাণপণে ধাক্কা দিয়ে নিজের শরীরটাকে প্রবেশ করাবার মতো রাস্তা করে নিলাম। উঠে এলাম উপরে। আবিষ্কার করলাম একটা সুন্দর সাজানো ঘর। এরপর থেকে প্রায়ই আমি প্রাসাদের এই ঘরটিতে আসতাম। আজ একটা বই নিয়ে বসেছিলাম জানালার ধারে একটা আরাম চেয়ারে। পড়তে পড়তে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল।

২৩। কাউন্ট একদিন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও আমি যেন না ঘুমোই। কিন্তু এই ঘরে আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানতেও পারিনি। আচম্‌কা ঘুম ভাঙতেই দেখি অন্ধকার নেমেছে। বুঝলাম এই ঘরে আমি আর একা নই, ঘরের তিন দিকে তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে জাগতে দেখেই একটি মেয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

২৪। ভয়ঙ্কর তার দৃষ্টি, দাঁতগুলো অস্বাভাবিক সাদা; আমি পিছু হটবার আগেই সে আমাকে ধরে ফেললো। প্রচণ্ড শক্তিতে আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরে তাতে দাঁত বসাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি কাটা ছাগলের মতো ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। হঠাৎ, এই ঘরে ঢুকে পড়লেন কাউন্ট। এক ঝট্‌কায় মেয়েটিকে সরিয়ে দিলেন।

২৫। কাউন্ট ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আর যদি কখনো তোমাদের দেখি, এমন শাস্তি দেব যে...কথা শেষ করবার আগেই মেয়ে তিনটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কাউন্ট আমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মেয়ে তিনটে আবার ঘরে ঢুকে রাগের স্বরে কাউন্টকে জিজ্ঞেস করল—আজ আমাদের জন্যে কি এনেছো?

২৬। কাউন্ট একটা ব্যাগ তাদের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই নাও। একটি মেয়ে ব্যাগের মুখ খুলতেই দেখা গেল, একটা আধমরা শিশুর দেহ ব্যাগের মধ্যে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শিশুটিকে দেখে তাদের সেকি পৈশাচিক আনন্দ! জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। জ্ঞান হতে দেখি আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। পকেট হাতড়ে ডাইরী খুলে ব্যাপারটা লিখে রাখলাম।

২৭। ১৮ মে দিনের বেলায় আবার আমি সেই ঘরটার সামনে এলাম। গতরাতে এই ঘরটাতেই সেই মেয়েটা আমার কণ্ঠ নালীতে দাঁত বসিয়ে রক্ত পান করার চেষ্টা করেছিল। আজ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও দরোজাটা খুলতে পারলাম না। মনে হলো ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে। কাউন্টের কথা অমান্য করায় তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট নন বোঝা গেল।

২৮। ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকবার কাউন্টকে বলেছি, এখানের কাজ তো শেষ হয়ে গেছে, এবার আমাকে ফিরে যেতে দিন। কাউন্ট বলেছেন আর একমাস আপনাকে এখানে থাকতে হবে। ২৪শে জুন রাতে কাউন্ট একটু তাড়াতাড়িই বিদায় নিলেন। কাউন্ট চলে যেতেই আমি জানালার কাছে উপস্থিত হ'লাম। উদ্দেশ্য, কাউন্টকে নজরে রাখা।
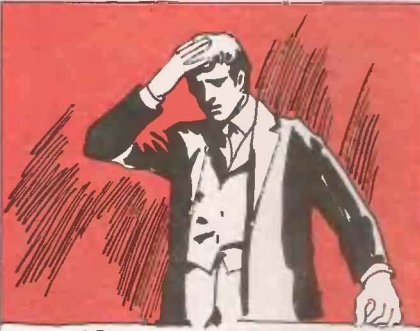
২৯। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম দূর থেকে নেকড়ের গর্জন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল, কেমন যেন একটা ঝিম্‌ঝিম্‌ ভাব; জাগা এবং ঘুমোনোর মাঝখানে যেন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। চোখের সামনে যেন অজস্র বিন্দু উড়ছে। আর তারা ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে।

৩০। আমি শিউরে উঠলাম। বিন্দুগুলো ক্রমে সেই ভয়ঙ্কর তিনটি নারীর আকার নিল; আমি চোখ বন্ধ করে, একছুটে বিছানায় চলে এলাম। রাগে শরীর জ্বলছিল, কিন্তু একা কি করব? হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম। গভীর চিন্তা থেকে স্বাভাবিক হ'লাম। কান পাতলাম—কোথা থেকে কান্না ভেসে আসছে?

৩১। কাউন্টের ঘরের সামনে কান পাততেই শুন্‌তে পেলাম একটা শিশুর কান্নার শব্দ; ছুটে এলাম দরোজার সামনে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে দরোজা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। একটু পরে কান্না থেমে গেল, চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। খাটের উপর বসে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলাম।

৩২। সহসা নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেসে এল এক মহিলার চিৎকার। তিনি তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা বলে চলেছেন। আমি দ্রুত চলে এলাম জানালার কাছে, দেখলাম, আলুথালু বেশে একজন মহিলা আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মড়া কান্না কেঁদে চলেছে। আমাকে দেখে তার দুঃখের প্রকাশ আরও বেড়ে গেল, দু-হাত তুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো—শয়তান দে, আমার খোকাকে ফিরিয়ে দে।

৩৩। অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় আমি কান চেপে ধরলাম, এক মায়ের করুণ অভিশাপ কোনো সুস্থ সৎ মানুষ শুনতে পারে না। ঠিক তখনই শুনতে পেলাম কাউন্টের বাজখাঁই গলার স্বর। কাকে যেন উদ্দেশ্য করে ডাকলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম বেশ কিছু নেকড়ের চিৎকার। মহিলাটি সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে পাগলের মত দিশাহারা হয়ে ছুটে চলে গেল। আমি ঘর থেকেই ওর মরণ চিৎকার শুনতে পেলাম।

৩৪। বুঝতে পারলাম, যে কোনো সময়ে আমারও শেষ সময় এসে যেতে পারে। একটা সত্য আমি বুঝতে পারলাম—মানুষ যখন তার মৃত্যুর কথা জেনে যায় তখন সে ভীষণ সাহসী হয়ে ওঠে। আমি ঘরময় পায়চারী করছিলাম, আর ভাবছিলাম কিভাবে এই নরককুণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জানালার ধারে এসে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

৩৫। আমি জুতো খুলে, জানালা পেরিয়ে কার্নিশে দাঁড়ালাম। নিচের দিকে তাকাতেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। খুব সাবধানে ভাঙা ইটের খাঁজে পা রেখে একসময় হাজির হলাম কাউন্টের ঘরের জানালার সামনে। কাঁচের সার্সি লাগানো পাল্লা দু'টো সামান্য ঠেলতেই হাট হয়ে খুলে গেল। জানলা টপ্‌কে ঘরে পা দিলাম।
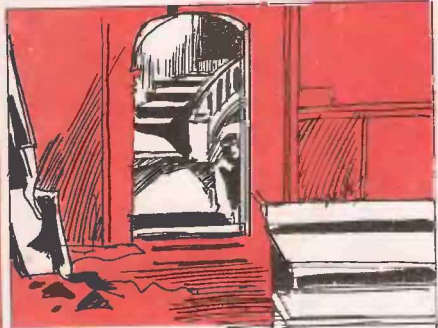
৩৬। আমার ঘরের মতই ঘরটি, পুরোনো সব আসবাবপত্রে ঠাসা। ঘরের এক কোণে দেখলাম ডাঁই করা স্বর্ণমুদ্রা। উল্টো দিকে দেওয়ালের দরজা খুলে নিচে নেমে যাওয়ার অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। জায়গাটাকে একটা কবরখানা বলা চলে। সাবেকি আমলের বাড়ির লাগোয়া এরকম কবরখানা থাকে। পরপর কয়েকটা কফিন রাখা আছে।

৩৭। একটা কফিনের পাশে সদ্য মাটি খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হল। এগিয়ে গিয়ে কফিনটার ঢাকা খুলতেই আমার চোখ কপালে উঠে গেল! সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। কফিনে স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলা টান টান হয়ে শুয়ে আছেন;তার চোখ দু'টো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে! মনে হল সে দুটো যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। সোজা ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম।

৩৮। ৩০ শে জুন। দিনের বেলা এই দুঃস্বপ্নের বাড়ীটা খুব বেশি শান্ত। বিরাট দরজাটা ধরে অনেক টানাটানি করলাম, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম। ভাঙবারও চেষ্টা করলাম, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এই দরোজার নিশ্চয়ই কোনো গোপন চাবি আছে। চলে এলাম কাউন্টের ঘরে, তন্নতন্ন করে খুঁজলাম সারা ঘর। কোথাও চাবি পেলাম না।

৩৯। আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম কবরখানায়, যেখানে কাউন্ট শুয়ে আছেন। হয়তো তাঁর কাছেই আছে দরজা খোলার চাবি। কফিনের ঢাকা খুলতেই দেখতে পেলাম সেই ঘৃণ্যতম পিশাচটাকে। সেই একই ভঙ্গীতে শুয়ে আছে । চেহারা দেখে জীবন্ত মনে হল। ঠোঁটের একধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত।

৪০। সেকি ভয়ঙ্কর তার দৃষ্টি, আমি চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললাম। রাগে দুঃখে আমি তখন প্রায় পাগল। পাশেই পড়ে ছিল একটা শাবল, শাবলটা তুলে কাউন্টের মাথায় শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মরণ আঘাত হানলাম। তাতেও তিনি সামান্য একটু নড়লেনও না। কফিনের ঢাকনা ধমাস করে বন্ধ করে দিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলাম।

৪১। আমি এই অভিশপ্ত মৃত্যু পুরীতে বন্দী। আর কিছু করবার নেই। দুর্ভাগ্যের জাল আমাকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে কিন্তু না, আমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না, কিছুতেই চলবে না। এ জাল আমাকে কেটে বেরোতেই হবে। সে সময় নিচে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল।
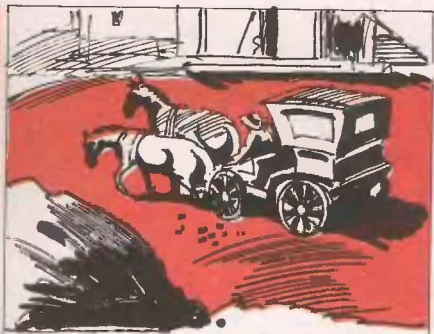
৪২। শোনা গেল ভারী ভারী জিনিস নামানোর শব্দ। মাটি ভরা কাঠের বাক্সগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কাউন্ট ড্রাকুলার লণ্ডন যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। নিচের ভারী দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল শেকলের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ। পাথর বাঁধানো খোলা জায়গাটায় ভারী চাকার ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল। কাঠের বাক্সগুলো গাড়িতে তোলা হয়ে গেল।

৪৩। তারা যেখানে যাবে সেদিকে গাড়ীগুলো রওনা দিল। দূরে মিলিয়ে গেল স্লোভাকদের গাড়ির আওয়াজ। কাউন্ট ড্রাকুলার মৃতের মত দেহও প্রাসাদ দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুদূর লণ্ডনের পথে। তিন ভয়ঙ্করী নারীর সঙ্গে এই অভিশপ্ত প্রাসাদ দুর্গে আমি একলা। ...যে ভাবেই হোক আমাকে পালাতে হবে।

৪৪। আমি প্রাসাদ-দুর্গের উঁচু পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করবো। কাউন্টের ঘরে গিয়ে কিছু সোনার মোহর সংগ্রহ করতে হবে আমাকে। পরে হয়তো অর্থের প্রয়োজন হবে। আমার নিজের কাছে তো একটা পয়সাও নেই। আমার সমস্ত জিনিসপত্তর আর টাকা-কড়ি তো শয়তান কাউন্ট সরিয়ে ফেলেছে। এই অভিশপ্ত পুরী থেকে বাইরে বেরোবার একটা পথ আমাকে বার করতেই হবে।

৪৫। ইংল্যাণ্ডের হুইটবী অঞ্চল। জায়গাটা ভারী সুন্দর। একটা নদী এসে সমুদ্রে মিশেছে এখানে। মোহনার কাছে নদী বেশ চওড়া। হুইটবী শহরটা হলো ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে। লুসি ওয়েস্টনদের একখানা বাড়ি আছে হুইটবীতে। ওদের পরিবার ছুটির দিনগুলো কাটাবার জন্যে এই বাড়িতে আসে। প্রিয় বান্ধবী লুসির আমন্ত্রণে মিনা বেড়াতে এসেছে হুইটবীতে। মিনা জোনাথন হারকারের ভাবী পত্নী।

৪৬। লুসি একদিন কথায় কথায় বললো খুব শিগগিরিই তার সঙ্গে আর্থার হোমউড-এর বিয়ে হচ্ছে। আর্থার সম্বন্ধে শুনতে শুন্‌তে মিনার মনটা খুব নরম হয়ে উঠলো। বারবার তার মনে পড়তে লাগলো জোনাথনের কথা। দেড়মাস হতে চললো, এখনো পর্যন্ত জোনাথনের কাছ থেকে একখানাও চিঠি পায়নি মিনা। সে কোথায় আছে, কেমন আছে কিছুই জানে না সে।

৪৭। তরা অগাষ্ট। আরও কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। জোনাথনের কোনো খবর নেই। এমনকি মিঃ হকিন্সকেও সে কোনো চিঠিপত্তর লেখেনি। ওর চিঠি লেখা উচিত ছিল। কিন্তু কেন লিখছে না? শরীর খারাপ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? আপাততঃ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা নেই।

৪৮। লুসির একটা রোগ আছে। সে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে শুরু করে। ঘুমোতে পারছে না আজ লুসি। মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে ঘুমের ঘোরে নিশি-পাওয়া লোকের মতো ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুদিন ও ভালো ছিল বলে দরোজায় তালা বন্ধ থাকতো না। লুসির বেরিয়ে যাবার শব্দে মিনার ঘুম ভেঙে গেল।

৪৯। কোনো রকমে 'ড্রেসিংগাউন'-টা গায়ে জড়িয়ে মিনা ছুটল তার পিছু পিছু। পুরোনো গীর্জার উঠোনে এসে মিনা দেখলো লুসি দরোজার পাশে একটা পাথরের আসনে বসে রয়েছে। প্রেতের ছায়ার মতো একটা বিরাট লম্বা কালো মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে ঘুমন্ত লুসির দেহের উপর। দারুণ আতঙ্কে মিনা চিৎকার করে উঠলো, লুসি! লুসি।

৫০। কালো মূর্তিটা মুখ তুললো। তাকালো তার দিকে। মিনা দেখলো কালো মূর্তিটার মুখ অসম্ভব সাদা, কিন্তু তার চোখ দু'টো জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। এরকম অস্বাভাবিক মূর্তি মিনা মুর জীবনে দেখেনি। মুহূর্তের মধ্যেই কালো ছায়াটা তার চোখের সামনেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। মিনা শিউরে উঠলো। এ যে কোনো জীবিত মানুষ নয়, সে সম্বন্ধে তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না।
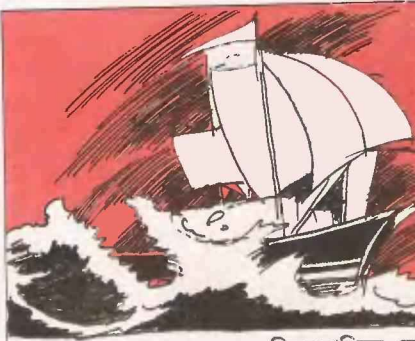
৫১। কোনো রকমে ঘুমন্ত লুসিকে বাড়িতে এনে সে বান্ধবীকে শুইয়ে দিল বিছানার উপর। সে অজ্ঞানের মতো বিছানায় পড়ে রইলো। লুসির গলায় কতকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন দেখে মিনা চমকে উঠলো। সে হলফ্ করে বলতে পারে, তার বান্ধবীর গলায় এরকম চিহ্ন আগে ছিল না। আগের দিন প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্র উথাল পাথাল হয়েছিল।
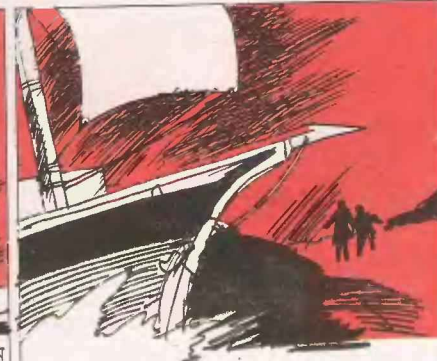
৫২। ঝড়ের পরদিন ভোরবেলায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আবহাওয়াও বেশ চমৎকার। লুসি এখন বেশ সুস্থ। মিনা আর লুসি সকালে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে গেল। অদূরেই চড়ায় আটকে আছে একটা রাশিয়ান জাহাজ। লোকজন তার খোলের ভিতর থেকে বড় বড় কতকগুলো কাঠের বাক্স বার করছে।

৫৩। দুই বান্ধবীকে আসতে দেখে যে রক্ষী উপকূল পাহারা দিচ্ছিল সে সুপ্রভাত জানালো। মিনা জিজ্ঞেস করলো, জাহাজের যাত্রীরা রক্ষা পেয়েছে? রক্ষী বললো, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা হয়েছে— তিনিও তো বেঁচে ছিলেন না মিস্। তাঁর দেহটাকে অবশ্য উদ্ধার করা হয়েছে।
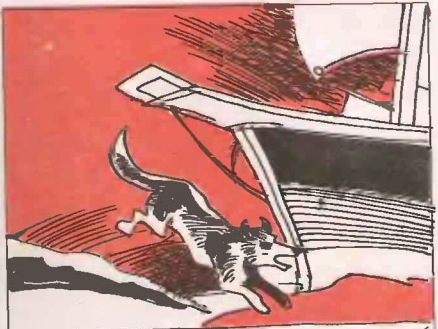
৫৪। জাহাজটি আসছিল বলকান অঞ্চলের ভার্না বন্দর থেকে। মাল বলতে ছিল কতোগুলো রূপোলী বালির বস্তা আর ঐ কাঠের বাক্সগুলো। আমরা যথাস্থানে বালির বস্তা আর বাক্সগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি। জাহাজে যে কোনো জীবিত প্রাণী ছিল না, একথা ঠিক নয়। জাহাজটি চড়ায় ধাক্কা খেতেই ডেকের উপর থেকে একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর তীরে লাফিয়েপড়ল।

৫৫। কয়েকদিনের মধ্যেই মিনা ভুলে গেল ভেঙ্গে পড়া জাহাজটার কথা। তার মনের মধ্যে সর্বদা জোনাথনের চিন্তা। অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই দুর্গম অজানা দেশে তার দেখাশোনা করছে কে? মিনার মনের আকাশ ছেয়ে গেল দুশ্চিন্তার কালো মেঘে। শেষ পর্যন্ত জোনাথনের খবর পাওয়া গেল। বুদাপেস্ট-এর সেন্ট জোসেফ এবং সেন্ট মেরী হাসপাতালের সিস্টার আগাথার চিঠি এলো মিনা মুরের নামে।
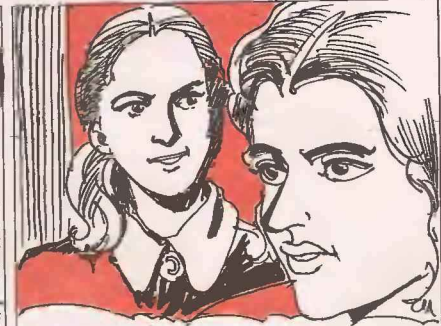
৫৬। মানসিক রোগগ্রস্ত জোনাথনের খবর পেল মিনা। যে কাজে মিঃ হকিন্স তাঁকে দূর দেশে পাঠিয়েছিলেন সে কাজ তিনি বেশ ভালভাবেই করে ফেলেছেন। তাঁর কাছে টাকা-পয়সাও যথেষ্ট নেই। এ চিঠি পাবার পর মিনা লুসিকে বললো, আমাকে জোনাথনের কাছে যেতেই হবে। লুসি, প্লীজ তুই কিছু মনে করিস্ না।

৫৭। —না না, তুই অবশ্যই যাবি। আমাকেও দু'একদিনের মধ্যে লণ্ডনে ফিরতে হবে। আর্থার সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। লুসি লণ্ডনে ফেরবার কয়েকদিন পরে আর্থার হোমউড একদিন দেখা করতে গেল বন্ধু সেওয়ার্ড-এর সঙ্গে। মানসিক রোগের ডাক্তার জন সেওয়ার্ড-এর বাড়ি পাগলা গারদের গায়েই।

৫৮। আর্থার, ডাক্তার সেওয়ার্ডকে বললো—লুসিকে নিয়ে খুবই চিন্তায় পড়েছি। শরীরটা ওর মোটেই ভালো নেই। দিন দিন ও কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। তুমি একবার লুসিকে দেখতে যাবে?—নিশ্চয়ই, যাবো। ডাক্তার সেওয়ার্ডও লুসিকে দেখে অসুস্থ বললেন। কিন্তু তার অসুস্থতার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। চেহারাটা কেমন যেন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

৫৯। ডাঃ জন সেওয়ার্ডের শিক্ষক আমস্টারডামের অধ্যাপক ভ্যান হেলসিঙ্-কে ডাকা হলো। তিনি এসে ভালো করে দেখলেন লুসিকে। লুসির গলার চিহ্নগুলি দেখে তাঁর মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠলো। ডাক্তার সেওয়ার্ডকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপক ভ্যান বললেন রোগীনীকে এক্ষুনি রক্ত দিতে হবে, না হলে যে কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু হতে পারে।

৬০। আর্থার লুসিকে রক্ত দিলো। এবার ডাঃ ভ্যান এর উপদেশ মত—মিস্ লুসির ঘরে রসুন ফুল রাখতে হবে। তারপর গম্ভীর গলায় ডাঃ ভ্যান বললেন, কোনো অবস্থাতেই যেন লুসির ঘর আর বিছানা থেকে রসুন ফুল সরিয়ে না ফেলা হয়। শোনো, জন,তুমি লুসির উপর সারারাত নজর রাখবে। ওর গলার দু'টি ক্ষতচিহ্ন নিয়েই ভাবছি। সারারাত তুমি জেগে থাকবে।

৬১। পরদিন বিকালে অধ্যাপক ভ্যান হেলসিঙ ফিরে এলেন। একটু পরেই অধ্যাপকের নামে বিদেশ থেকে একটা বড় পার্শেল এলো। পার্শেলটা খুলতেই দেখা গেল একগুচ্ছ সাদা ফুল। লুসির জন্যে এগুলো আনানো হয়েছে। এগুলি লুসির ঘরের জানলায়, ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আর বাকী ফুলগুলির মালা গেঁথে লুসির গলায় পরিয়ে দেওয়া হল।

৬২। বেশ ভালোই হয়ে উঠছিল লুসি। একদিন গভীর রাতে জানালার কাঁচের সার্সির গায়ে ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দে লুসির ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে, কেউ কোথাও নেই। কেবল একটা বিশাল বাদুড় জানালার সার্সিতে ডানা ঝাপটাচ্ছে। বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে হলো না। লুসির মা মেয়েকে বিছানায় বসে থাকতে দেখে ঘরের ভিতর ঢুকলেন।

৬৩। মাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরলো লুসি। মা, তুমি আজকের রাতটা আমার সঙ্গে থাকো। সার্সিতে আবার ডানা ঝাপটানোর শব্দ। বাইরের বাগান থেকে হিংস্র নেকড়ের গর্জন শোনা গেল। একটু পরেই ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। দম্‌কা বাতাসে জানালার পর্দা সরে গেল। সার্সির ভিতর দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিল একটা প্রকাণ্ড ছাই রঙের হিংস্র নেকড়ের মুখ।

৬৪। ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে লুসির মা বিছানার ওপর উঠে বসলেন। হাত বাড়িয়ে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন তিনি। তাঁর হাত লেগে লুসির গলার রসুনের মালাগাছা ছিঁড়ে গেল। এই মালাগাছা ডাঃ ভ্যান নিজের হাতে লুসির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। দারুণ আতঙ্কে মা ও মেয়ের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। তারা ভাঙা জানালার দিকে বোবা চোখে চেয়ে রইলেন।

৬৫। লুসির মায়ের গলা থেকে অদ্ভুত ঘড়ঘড় আওয়াজ হতে লাগলো। সে আওয়াজ এমনই যে ভীতা লুসি আরো ভয় পেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ লুসির মা বাজপড়া মানুষের মতো পড়ে গেলেন। পড়বার সময় তাঁর মাথা সজোরে ধাক্কা মারলো লুসির কপালে। লুসির মাথা ঘুরে গেল। একসময় জানলা থেকে নেকড়ের মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল।
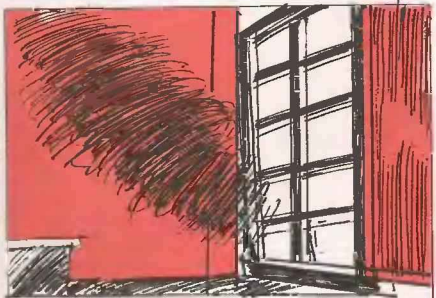
৬৬। ভাঙা জানালা দিয়ে হু হু করে প্রচুর ধুলো ঘরের ভিতর ঢুকতে লাগল। গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেগুলো ঘুর্ণিঝড়ের সময় মরুভূমির বুকে যেমন ছোট ছোট বালির ঢিপি তৈরী করে, সেইরকম আকার নিতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে ধূলিকণাগুলো একটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে শুরু করল—তাই দেখে আতঙ্কে লুসির চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। লুসি জ্ঞান হারাল।

৬৭। একটু পরেই তার জ্ঞান ফিরে এল। ঘরের ভিতরে তার মায়ের মৃতদেহ। ধুলিকণাগুলো তখনও গোল হয়ে ঘুরছে। আশপাশের সব কুকুরগুলো চীৎকার করতে শুরু করল। দূরে মাঝে মাঝে শোনা গেল নেকড়ের ডাক। মায়ের মৃতদেহ আগলে লুসি বসে রইল। পরম করুণাময় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।

৬৮। পরদিন সকালে অধ্যাপক হেলসিঙ্ আর ডাঃ সেওয়ার্ড বাড়িতে এসে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। দেখলেন মা আর মেয়ে দু'জনেই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে। মেয়ে অজ্ঞান—মা মৃতা। মৃতদেহের মুখটা খোলা। মুখে আতঙ্কের ছাপ। লুসির মুখ ফ্যাকাসে। যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই। আর গলার ক্ষতচিহ্ন, আকারে আরো বড় হয়েছে।

৬৯। কোনো কথা না বলে অধ্যাপক লুসির বুকের উপর কান পাতলেন। তারপর লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত ভাবে বললেন, না না, এখনও আশা আছে, জন, শিগ্‌গির যাও, ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো। সেওয়ার্ড নিচে থেকে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসতেই অধ্যাপক হেলসিঙ্ গরম জল চাইলেন বেশ কিছুটা। ব্র্যাণ্ডি খাওয়ানোর পর গরম জলে অধ্যাপক লুসির সর্বাঙ্গ ঘষে ঘষে তার দেহটাকে গরম করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

৭০। আবার রক্ত দেওয়ার পালা, এবার রক্ত দিলেন মিঃ কুইনসি মরিস। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। লুসির অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সারারাত লুসি স্থির হয়ে ঘুমোতে পারে না, ঘুমের মধ্যে ছটফট করে। অজানা ভয়ে বারবার চমকে ওঠে। অধ্যাপক হেলসিঙ্ আর ডাঃ সেওয়ার্ড পালা করে তাকে পাহারা দিচ্ছেন সারারাত।

৭১। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে সবাই অবাক হয়ে গেলেন যে, জেগে থাকলে লুসিকে ফ্যাকাসে এবং দুর্বল দেখায়। বড় অসহায় মনে হয়। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় লুসিকে ততোটা নিস্তেজ মনে হয় না। বরং তাকে সুস্থ ও সবল মনে হয়—কেমন সুন্দর মনে হয়। হৃৎপিণ্ডের গতিও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ঘুমের মধ্যে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে গেলেই তীক্ষ্ণ, ঝক্‌ঝকে ধারালো, কুকুরের মত দুটো দাঁত দেখা যায়।

৭২। আরও একটা রাত কেটে গেল। লুসির অবস্থা আরও খারাপের দিকে। ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে লুসির কুকুরের মত দাঁত দুটো আরও লম্বা। আরো ধারালো মনে হচ্ছে ওর গলার ক্ষতচিহ্ন দু'টো যেন মিলিয়ে গেছে। আর্থার হোমউডও লুসির শেষ শয্যার পাশে। তার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোচ্ছে না। অধ্যাপকের আদেশে আর্থার লুসির দুর্বল হাত দু'খানা তুলে নিল নিজের দু হাতের মধ্যে। লুসি ঘুমিয়ে পড়ল।

৭৩। লুসির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক গতি হারিয়ে এলোমেলো হয়ে গেল। ওর ঠোঁট দু'টি খুলে গেল, বেরিয়ে পড়ল দু'টি ঝক্‌ঝকে কুকুর-দাঁত। লুসির চোখের পাতা দুটো খুলে গেল। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল নয় কিন্তু বেশ কঠিন। ভীষণ কামনাভরা গলায় সে বললো—আর্থার! প্রিয়তম এসেছো! আমার কাছে এসো—আমাকে চুমু দাও।
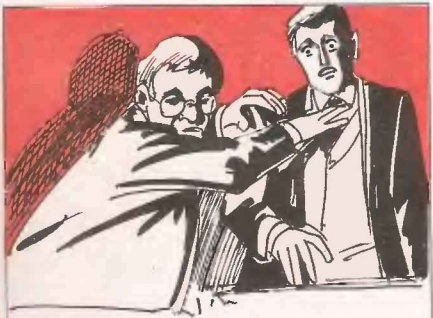
৭৪। লুসিকে চুমু খাবার জন্যে আর্থার হোমউড আগ্রহের সঙ্গে মাথা নিচু করলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ডাঃ ভ্যান হেলসিঙ্ তাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে বললেন, আপনার জীবনের দোহাই। এখন নয়...এখন নয়। ডাঃ সেওয়ার্ড এবং আর্থার হোমউড দু'জনেই অধ্যাপকের এই আচরণে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন।

৭৫। একটু পরেই লুসির মুখের ভাব আবার কোমল হয়ে গেল। দুর্বল হাত বাড়িয়ে সে অধ্যাপকের একখানা হাত ধরল। তারপর অতিকষ্টে অধ্যাপকের হাতখানি মুখের কাছে নিয়ে সেই হাতে চুমু খেয়ে দুঃখের সঙ্গে দুর্বল স্বরে বললো, আমার সত্যিকারের বন্ধু...আর্থারের সত্যিকারের বন্ধু!...ওকে রক্ষা করুন... আমাকে শান্তি দিন...মুক্তি দিন।

৭৬। এবার আর্থারের দিকে তাকিয়ে ডাঃ হেলসিঙ্ বললেন, এবার আসুন, ওর কপালে চুমু দিন। মনে রাখবেন একবারের বেশি চুমু কিন্তু দিতে পারবেন না। একটু পরেই লুসির মৃত্যু হল। আর্থার হোমউড কঁকিয়ে কেঁদে উঠলেন। ডাঃ সেওয়ার্ড দেখলেন অধ্যাপক হেলসিঙ্ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সদ্যমৃতা লুসির মুখের দিকে।

৭৭। অধ্যাপকের দৃষ্টি যেন কঠোর। লুসির দেহেও এসেছে আশ্চর্য পরিবর্তন। মৃত্যু যেন ওর আগেকার সৌন্দর্যের অনেকটাই ফিরিয়ে দিয়েছে। দু'গালে লালের ছোপ ফিরে এসেছে, ঠোঁট দুটোতে ফিরে এসেছে লালচে আভা। দেখলে মনে হয় লুসি যেন মরেনি—ঘুমিয়ে আছে। অধ্যাপক হেলসিঙ্ গম্ভীর গলায় বললেন, জন, এই তো সবে শুরু। হ্যামস্টেড-এ লুসির সমাধি দেওয়া হল।

৭৮। অধ্যাপক হেলসিঙ খুব গম্ভীর স্বরে বললেন—এবার লুসিকে নিয়ে সমস্যা হবে। চল, আজ রাতে আমি তোমাকে প্রমাণ দেব। আমরা যাবো লুসির কবরখানায়, সেখানেই তুমি বুঝতে পারবে যে আমার ধারণা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য। নিঃশব্দে দু'জনে এসে দাঁড়ালেন কবরখানার সামনে। সেখানকার একটি ঘরের তালা খোলার পর অধ্যাপক একটা মোমবাতি জ্বালালেন।

৭৯। অধ্যাপক এবার ব্যাগের ভেতর থেকে বার করলেন 'স্ক্রু' খোলবার একটা ছোট্ট যন্ত্র। তারপর কফিনের 'স্ক্রু'-গুলো খুলতে লাগলেন ডাঃ হেলসিঙ। সবগুলো খোলা হলে তিনি কফিনের ডালাটা তুলে ধরে বললেন "দেখ জন"। ডাঃ সেওয়ার্ড নিজের চোখ দু'টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কফিন শূন্য! সেখানে কোনো মৃতদেহ নেই!

৮০। ডালা বন্ধ করে 'স্ক্রু' এঁটে কবরখানার বাইরে বেরিয়ে এলেন দুজনে। ডাঃ হেলসিঙ্ বললেন—এবার আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তুমি একদিকে আর আমি আর এক দিকে নজর রাখবো। দু'জনে দু'টো গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দূরে কোনো ঘড়িতে রাত বারোটা বাজলো। তারপর একটা বাজল, বাজলো দু'টো। কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপুনি শুরু হলো জন-এর।

৮১। হঠাৎ ডাঃ সেওয়ার্ড দেখতে পেলেন দু'টো অন্ধকার ইউ গাছের মধ্যে দিয়ে একটা সাদা মূর্তি এগিয়ে আসছে কবরখানার দিকে। ছায়ামূর্তিটার দিকে ছুটলেন অধ্যাপক। ডাঃ সেওয়ার্ড অধ্যাপককে অনুসরণ করলেন। অদূরে জুনিপার গাছের সারির মধ্যে দিয়ে একটা অস্পষ্ট সাদা মূর্তি যেন উড়ে চলে গেল কবরখানার দিকে। হঠাৎ কাছেই একটা শব্দ শুনে চম্‌কে তাকালেন সেওয়ার্ড।

৮২। দেখলেন অধ্যাপক হেলসিঙ্ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। অধ্যাপকের কোলে একটি শিশু। সেওয়ার্ডের দিকে শিশুটিকে তুলে ধরে হেলসিঙ্ বললেন, কি এবার বিশ্বাস হলো? গীর্জার ঘেরা জায়গাটা থেকে দু'জনে বেরিয়ে কিছুটা দূরে এসে অধ্যাপক দেশলাই জ্বেলে ঘুমন্ত শিশুর গলার কাছে ধরলেন। না, গলায় ক্ষত চিহ্ন নেই। আমরা ঠিক সময়েই এসে পড়ায় শিশুটির কোনো ক্ষতি হয়নি।

৮৩। ঘাসে ঢাকা বিরাট একটা জায়গায় গিয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই পুলিশের ভারী পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বাচ্চাটিকে পথের ওপর শুইয়ে রেখে ওরা দু'জন চট্ করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। লন্ঠনের আলো দোলাতে দোলাতে কর্তব্যরত পুলিশ এসে বাচ্চাটিকে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে চলে গেল।

৮৪। পরদিন দুপুরে আবার দু'জনে এল কবরখানায়। ডাঃ হেলসিঙ্ লুসির কফিন খুলে ফেলতেই অবাক হয়ে গেলেন। কফিনের মধ্যে নিশ্চিন্তে লুসি শুয়ে আছে। তার মৃতদেহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে। তার ঠোঁট দু'টি লাল টকটকে। মনে হচ্ছে সুন্দরী লুসি মরেনি—কফিনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। শুধু লুসির কুকুর-দাঁত দু'টি আরো বড়—আরো ঝক্‌ঝকে আরো ধারালো হয়ে উঠেছে।

৮৫। ডাঃ হেলসিঙ্ বললেন—লুসির অজ্ঞান অবস্থাতেই পিশাচ্ আসতো তার রক্ত পান করতে। আচ্ছন্ন এবং সম্মোহিত অবস্থাতেই লুসির মৃত্যু হয়েছে। তাই তথাকথিত মৃত্যুর পরেও লুসি হয়েছে অ-মৃতা। আমি স্থির করেছি যতো নিষ্ঠুর আর কঠিনই হোক না কেন আমি ঘুমের মধ্যেই ওকে হত্যা করবো।

৮৬। পরদিন অধ্যাপক হেলসিঙ্, আর্থার, কুইনমরিস ও ডাঃ সেওয়ার্ড বেলা দেড়টা নাগাদ হ্যাম্পস্টেডের কবরখানায় এলেন। লুসির কফিনের ডালা খুলে ফেলা হলো। অপূর্ব সুন্দরী লুসি শুয়ে আছে কফিনের মধ্যে। তার ধারালো দাঁত, রক্তমাখা, লোভে চকচকে মুখখানা যেন পিশাচের ভঙ্গীতে তামাশা করছে জীবন্ত মানুষদের।
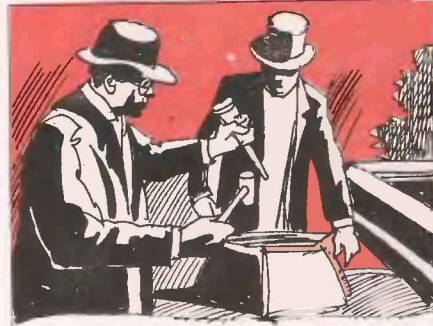
৮৭। অধ্যাপক হেলসিঙ্ তাঁর ব্যাগের ভেতর থেকে তাঁর জিনিসপত্র বের করে মাটিতে সাজিয়ে ফেললেন। তারপর প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিলেন। প্রস্তুতি শেষ হতেই সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন, কাজ শুরু করবার আগে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কথা বলতে চাই। অ-মৃতদের সম্পর্কে আমি যা কিছু পড়াশুনা করেছি তার উপর ভিত্তি করেই একাজ করছি।

৮৮। রক্ত পিপাসু লুসিকে বিশেষ পদ্ধতিতে হত্যা না করলে সে মুক্তি তো পাবেই না বরং দিন দিন আরো ভয়ঙ্করী হয়ে উঠবে। বলুন, আমাদের মধ্যে কে লুসিকে স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য সাহায্য করবেন? এ ব্যাপারে কার অধিকার সবচেয়ে বেশী। এ কথায় আর্থার হোমউড এগিয়ে এসে বললে, ডাঃ হেলসিঙ্ বলুন আমাকে কি করতে হবে?

৮৯। ডাঃ হেলসিঙ্-এর কথা মতো আর্থার ডান হাতে হাতুড়ি আর বাম হাতে একটা গোঁজ তুলে নিলো। হেলসিঙ্ স্তোত্রপাঠ শুরু করলেন। ডাঃ সেওয়ার্ড এবং কুইনসি মরিসও তাঁর সুরে সুর মেলালেন। লুসির হৃৎপিণ্ডের উপরে গোঁজের ছুঁচলো দিকটা রেখে আর্থার হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করলো গোঁজটার মাথায়। সূচীমুখ গোঁজটা অ-মৃতা লুসির বুকের মধ্যে গেঁথে গেল।

৯০। কফিনটার মধ্যে যেন ভয়ঙ্কর ঝড় শুরু হলো। লুসির দেহটা যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর ভাবে পাক খেতে লাগলো। মহানরকের অন্ধকার গর্ত থেকে রক্ত জল করা আর্তনাদ শোনা গেল। ধারালো দাঁতগুলো কিড়মিড় করতে লাগলো। রক্তের মত লাল ফেনায় ভরে গেল অ-মৃতার সমস্ত মুখ। অবশেষে লুসির দেহ শান্ত স্থির হয়ে গেল। তার মুখটা স্বর্গীয় পবিত্রতায় ভরে উঠল।

৯১। অধ্যাপক হেলসিঙ্ নিজে লুসির মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। তারপর সেই কাটা মুণ্ডুর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন রসুনের কোয়া। কফিনের ডালাটা বন্ধ করে ঝালাই করে দেওয়া হলো। তারপর কবরখানার ঘরটার দরোজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা তুলে দিলেন আর্থারের হাতে। পথে যেতে যেতে অধ্যাপক বললেন—আমাদের কাজের একটা পর্ব শেষ।

৯২। এবার নাটের গুরুটিকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। তাকেও ঠিক এমনি করেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে হবে। কিছু সূত্র আমার হাতে আছে। সেই সূত্র ধরেই এগোতে হবে আমাদের। আপনাদের সকলের সাহায্য চাই। আমি আজ রাতেই একটা বিশেষ দরকারে আমস্টারডামে ফিরে যাচ্ছি। কাল রাতে ফিরবো। এসেই কাজ শুরু করে দেবো।

৯৩। এদিকে মিনা সিস্টার আগাথার চিঠি পেয়ে বুদাপেস্টের হাসপাতালে অসুস্থ জোনাথনকে দেখতে এসেছে। মিনার সেবাযত্নে জোনাথন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। মিনাকে উদ্বিগ্ন দেখে জোনাথন একদিন তাকে তার ডায়েরীখানা দিয়ে বললো—এই খাতাখানা পড়লেই আমার অসুস্থতার কারণ সব জানতে পারবে।

৯৪। জোনাথনের আগ্রহে এবং অনুরোধে বুদাপেস্টেই মিনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। মিনা মুর হলো মিনা হারকার। জোনাথন আর একটু সুস্থ হতেই মিনা তাকে নিয়ে দেশে ফিরে এল। ওরা স্বামী-স্ত্রী এসে উঠলো আইনজীবী মিঃ হকিন্সের বাড়িতে। মিঃ হকিন্সের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। জোনাথনকে তিনি তাঁর আইন ব্যবসায়ের অংশীদার করে নিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মিঃ হকিন্সের মৃত্যু হলো।

৯৫। একদিন সন্ধ্যার পর মিনা আর জোনাথন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। মিনা হঠাৎ লক্ষ্য করলো জোনাথন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার ওপাশের একজন লম্বা রোগা লোকের দিকে। সে লোকটা আবার তাকিয়ে রয়েছে গাড়িতে বসা সোনালী চুলের এক সুন্দরীর দিকে। লোকটার চুল কালো। তার মুখে কালো গোঁফ আর ছুঁচলো দাড়ি। লাল ঠোঁটের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি।

৯৬। কাঁপা গলায় জোনাথন বললো, ঐ সেই পিশাচ। ঐ লোকটাই ড্রাকুলা। কিন্তু শয়তান কাউন্ট একবারে যুবক হয়ে গেলেন কি করে! শয়তানটা তাহ'লে লণ্ডনে এসে গেছে! দারুণ ভয়ে জোনাথন থর থর করে কাঁপতে লাগলো। অভিশপ্ত দুর্গের পিশাচ এখন খাস লণ্ডন শহরে! জোনাথনের মাধ্যমেই এদেশে সম্পত্তি কিনেছে ড্রাকুলা।
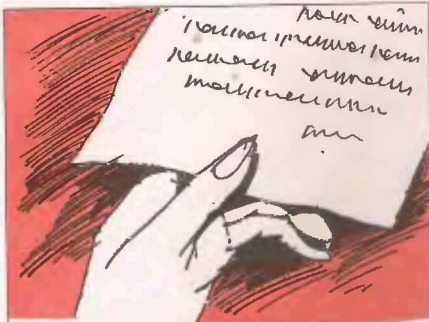
৯৭। এই সময়েই লুসির বান্ধবী মিনার কাছে এল ডাঃ হেলসিঙ্-এর চিঠি। তিনি মিনার সাহায্য চান। এক দুরন্ত অশুভ পৈশাচিক শক্তির হাত থেকে তিনি মানবসমাজকে রক্ষা করতে চান। তাঁর ধারণা এ ব্যাপারে মিনা অনেক কিছুই জানে। ডাঃ হেলসিঙ্ এলেন মিনার কাছে। মিনার কাছ থেকেই অধ্যাপক জানতে পারলেন ড্রাকুলার লণ্ডনে আসবার কথা।

৯৮। কয়েকদিন পর ডাঃ সেওয়ার্ডের বৈঠকখানায় জরুরী বৈঠক বসল। বৈঠকে হাজির হলেন ডাঃ হেলসিঙ্, আর্থার হোমউড, মিঃ কুইনসি মরিস, মিনা হারকার, জোনাথন হারকার এবং ডাঃ সেওয়ার্ড। অধ্যাপক বললেন—ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। দিনের বেলায় অ-মৃত পিশাচের কোনো ক্ষমতা থাকে না।

৯৯। তখন তাকে থাকতে হয় কফিনের মধ্যে বা কোনো অভিশপ্ত স্থানে। কেবল সূর্যাস্তের পরই পিশাচ সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। রসুন, গীর্জার পবিত্র ধুলো এবং পবিত্র ক্রুশকে সে ভীষণ ভয় করে আর কফিনের ওপর বুনো গোলাপের ডাল রাখলেও সে আর কফিনের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না।

১০০। কিন্তু এই শয়তান কাউন্ট মহা ধূর্ত। তার অতীত ইতিহাস জানবার জন্যে আমি বুদাপেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্মিনিয়াসকে চিঠি লিখে ছিলাম। তিনি লিখেছেন, তাঁর মতে এই কাউন্ট ড্রাকুলা হলেন ভোইভোড ড্রাকুলা। তিনি একদা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে বিখ্যাত হন।

১০১। আর্মিনিয়াস লিখেছেন ড্রাকুলারা হলো এক মহান অভিজাত বংশের সন্তান। লোকে জানে, এই বংশের কোনো কোনো সন্তান নাকি স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁরা অনেক অলৌকক ক্ষমতার অধিকারী হন। একটা পুরোনো পাণ্ডুলিপিতে এই বিশেষ ড্রাকুলাকে ভ্যামপায়ার বা রক্তচোষা পিশাচ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০২। আমরা জেনেছি কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ থেকে পঞ্চাশটি মাটি ভরা কাঠের বাক্স লুটবীতে পাঠানো হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে সবগুলি বাক্স আনা হয় 'কারফাক্স'-এ। পাশের বাড়িটার নামই 'কারফাক্স'। খবর নিয়ে জেনেছি যে কাউন্টই ও বাড়িখানা কিনেছে। দিনের বেলায় কাউন্ট ড্রাকুলার লুকিয়ে থাকার জায়গার প্রয়োজন।

১০৩। ডাঃ হেলসিঙ্-এর নেতৃত্বে সবাই বেরিয়ে পড়লেন। কারফাক্সে ঢুকবার আগে অধ্যাপক হেলসিঙ্ প্রত্যেকের হাতে একটি করে ক্রুশ এবং একগাছি করে রসুনের মালা দিয়ে বললেন, এই ক্রুশ আর মালা গলায় পরে নিন। সবাই তাই করলেন। আর কোনো অশুভ শক্তি আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

১০৪। লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে একটা ভাঙা দরোজা দিয়ে সবাই ঢুকলো কারফাক্সে। বাড়িটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। ঘরের মেঝেটা ধূলোয় ভর্তি। জনমানবহীন অব্যবহৃত পোড়ো বাড়ি। কিন্তু সেখানে যে এক অদৃশ্য অশুভ শক্তি আছে—সেটা সকলেই বুঝতে পারলেন। নাকে আসছে একটা বিশ্রী গন্ধ। বাড়ির গায়েই রয়েছে অত্যন্ত পুরনো একটা উপাসনা গৃহ।
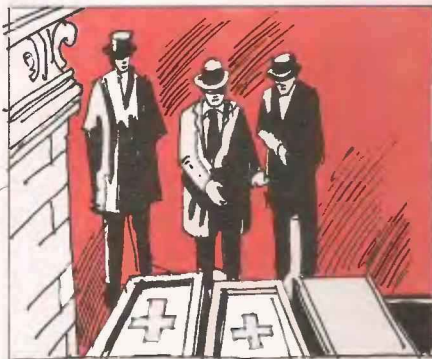
১০৫। সেই উপাসনা গৃহে কতোকগুলো কাঠের বাক্স দেখা গেল। সেখানকার বাতাস আরো বিশ্রী, আরো ঝাঁজালো আর বিষাক্ত। গুণে দেখা গেল পঞ্চাশটা বাক্সের মধ্যে মাত্র ঊনত্রিশটা বাক্স রয়েছে সেখানে। মানে একুশটা বাক্সকে ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

১০৬। হঠাৎ আর্থার কবরখানার ঘরের অন্ধকার দরোজার দিকে তাকালেন। জোনাথনও তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালো। দেখলো, ছায়ার সঙ্গে গা মিশিয়ে একটা প্রেতের ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলা। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল কাউন্টের খাড়া নাক, কুৎসিত মুখ, লালচে আগুন ঝরানো চোখ এবং রক্তের মত লাল দু'খানা ঠোঁট।

১০৭। কিন্তু পরিষ্কার ভাবে কিছু বোঝবার আগেই মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর্থার বললেন, মনে হলো একটা কদাকার কুৎসিত মুখ যেন দেখতে পেলাম। জোনাথন বাতি নিয়ে কবরখানার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু না; কেউ কোথাও নেই; ভিতরে লুকিয়ে থাকবার মতো কোনো জায়গাও নেই।
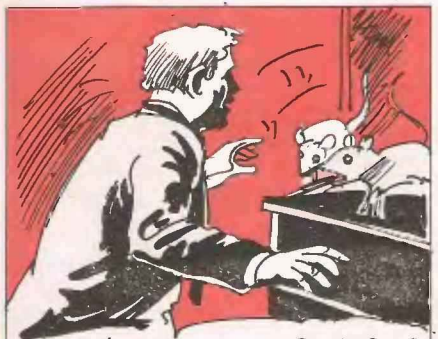
১০৮। হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে মিঃ কুইনসি মরিস লাফিয়ে সরে এলেন। কোণের দিকে তাকিয়ে সবাই দেখলেন, কোণের ধূলোর রাশি ঘূর্ণি ঝড়ের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য আলোর কণা। হঠাৎ হাজার হাজার ইঁদুরে ঘর ভরে গেল। কণাগুলো হলো অসংখ্য ইঁদুরের জ্বলন্ত চোখ। ইঁদুরেরা হুটোপুটি শুরু করলো।

১০৯। আর্থার হোমউড পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে বাজাতেই আর্থারের পোষা তিনটে বিশাল টেরিয়ার কুকুর ঘরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইঁদুরগুলোর ওপর। স্বস্তি ফিরে পেয়ে এবার ডাঃ হেলসিঙ্-এর নেতৃত্বে সবাই পবিত্র বস্তু দিয়ে বাক্সগুলিকে দোষশূন্য করতে লাগলেন।

১১০। কাউন্ট ড্রাকুলা আবার তার প্রাসাদ দুর্গের দিকে রওনা দিয়েছেন। ড্রাকুলার কাঠের বাক্সটা জলপথে নিয়ে যাবারই সম্ভাবনা থাকায় পরিকল্পনা মত সবাই তাই অনুসরণ করে চললো। অবশেষে প্রাসাদ দুর্গের সামনে এসে ব্যাগের ভেতর থেকে একটা বড় হাতুড়ি বার করলেন ডাঃ হেলসিঙ্। হাতুড়ি দিয়ে দরোজার প্রকাণ্ড তালাটা ভেঙে ফেলে সবাই কবরখানার প্রাসাদ বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

১১১। ডাঃ হেলসিঙ্ কবরখানার বাড়ীটার সর্বত্র এবং পাথরের বিশাল কফিনটার মধ্যে গীর্জার পবিত্র ধূলো এবং অন্যান্য বস্তু ছড়িয়ে দিলেন। অধ্যাপক বাক্সটার ডালা খুলতেই দেখা গেল কাউন্ট ড্রাকুলা তার মধ্যে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ মোমের মতো সাদা। লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ধারালো দাঁতের সারি এবং তীক্ষ্ণ দু'টি কুকুর-দাঁত।

১১২। বিদ্যুৎ গতিতে জোনাথনের বিরাট ছোরাখানা কাউন্টের গলার উপর নেমে এলো। মুণ্ডুটা তার দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। মিঃ কুইন্সি মরিসের বাঁকানো ধারালো অস্ত্রটা ঢুকে গেল কাউন্টের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। অধ্যাপক কাটামুণ্ডুর মুখে রসুনের টুক্‌রো গুঁজে দিলেন। পৃথিবী এখন কাউন্ট ড্রাকুলার কবল থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পেল।

ছবি—গৌতম চট্টোপাধ্যায়

রচনা—সুশান্ত কুমার পাল